“আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি”

মো: আলী আজম

পৃথিবীর তাবৎ স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস আছে। গৌরবোজ্জ্বল ব্যতিক্রম হিসেবে, বাঙালির বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসের সাথে সাথে অর্থবহ বিজয় দিবসও আছে। কোন দেশের স্বাধীনতার মর্ম, গুরুত্ব নিরূপিত হয় তার পরাধীনতার যন্ত্রণা এবং তা লাঘবে আত্মত্যাগের ব্যাপকতায়। যুগ মহাযুগব্যাপী ঔপনিবেশিক শক্তির হাতে শোষিত, নির্য্যাতীত বাঙালির বঞ্চনা-লাঞ্ছনার যেমন শেষ ছিলনা তেমনি পরাধীনতার শেকল ভাঙ্গতে জানকবুল লড়াইয়েরও কমতি ছিলনা। ভারতবর্ষ এবং সর্বশেষ পাকিস্তানী ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে থেকে স্বাধীনতার জন্যে আত্মত্যাগে বাঙালি বরাবর অগ্রগামী থাকলেও শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর জনগোষ্ঠী হিসেবে নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং ভৌগলিক ঠিকানা নির্ধারণে টানাপড়েন, অস্পষ্টতাও তার অনুগামী ছিল। ইংরেজ শাসনের অবসানের পর দ্বিখন্ডিত ভারতবর্ষের পাকিস্তান অংশে চরম ঔপনিবেশিক বঞ্চনা ও নিপীড়নের মধ্য দিয়ে সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্ধ, অস্পষ্টতা কাটিয়ে বাঙালির জাতিয়তাবোধ ও রাষ্ট্রচেতনা পুষ্ট হতে থাকে এবং আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের মূল প্রপঞ্চ জনমত তথা “উইল অফ দ্য পিপল” দানা বাধতে থাকে। এই জনমতের অন্যতম সংগঠক এবং চূড়ান্ত পর্য্যায়ে মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমান নামে এক অকুতোভয় ভূমিপুত্র। তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে পরিবর্তিত যুগান্তকারী অসম্প্রাদায়িক জাতি চেতনার প্রতীক আওয়ামী লীগ নামের জাতিয়তাবাদী গণ-সংগঠন এই সময়ের মূল রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মঞ্চ। উনসত্তুরের গণ-অভ্যূত্থানে ক্ষেতে-খামারে, মাঠে-ময়দানে, রাজপথে এই ভাটি জনপদের মানুষ দ্ব্যর্থহীনভাবে তোমার আমার ঠিকানা, তুমি কে আমি কে, তোমার নেতা আমার নেতা্ ইত্যাদি শ্লোগানে শ্লোগানে নিজেদের আত্মোপলব্ধির হদিশ দেয় যথাক্রমে - বাংলাদেশ, বাঙালি ও বঙ্গবন্ধু । রাষ্ট্রের ভৌগলিক পরিচয়, সংঘবদ্ধ জাতীয় পরিচয় এবং তা অর্জনের নেতৃত্ব নির্ধারন করে নেয় এই জনপদের মানুষ। পঁচিশে মার্চ’র কালরাতে ঘুমন্ত জাতির উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানী হায়েনারা। তাদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বমুহূর্তে স্বাধীনতার ঘোষনা দিয়ে যান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু। তাঁর সে ঘোষনা তাৎক্ষণিক দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানী হায়েনাদের বর্বর আক্রমণ এবং তা সর্বশক্তিতে প্রতিহত করতে জাতির জনকের নির্দেশের মধ্য দিয়ে সভ্যতার নৃতাত্বিক ইতিহাসে বাঙালি জাতির আত্মপ্রকাশ। দীর্ঘ নয় মাস ব্যাপী মরণপন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এই অসম্প্রাদায়িক জাতীয় ঐক্যের পরীক্ষায় অবতীর্ন হয় বাঙালি। চরম আত্মত্যাগ এবং ইস্পাত কঠিন ঐক্যের এই পরীক্ষায় পরম সাফল্যের স্মারক- ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১- শত্রুমুক্ত বাংলাদেশের বিজয় দিবস। বিশ্ব মানচিত্রে জাতি রাষ্ট্র বাংলাদেশের আত্ম প্রকাশের দিন। জাতিয়তাবাদী আন্দোলন, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালিত্বের অধিষ্টান দিবস।

পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে ধাপে ধাপে রাজনীতির মাধ্যমে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার আন্দোলন-সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু কিংবা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একক প্রতিষ্ঠান নন। সহযোগী রাজনৈতিক সংগঠন সমূহেতো বটেই নিজের সংগঠনেও শ্রদ্ধাভাজন রাজনৈতিক মুরুব্বী, উচ্চ শিক্ষিত সহকর্মীরা ছিলেন। প্রতিযোগী সংগঠন সমূহেও ছিলেন উদ্দেশ্য, আদর্শে ভিন্নমতাবলম্বী ডাকসাইটে রাজনীতিবিদগন। এই পরিস্থিতি প্রেক্ষাপটে জনদাবী নির্ধারণে বিচক্ষণতা, আন্দোলনের কর্ম পন্থা নির্বাচনে দক্ষতা এবং সর্বোপরি জন সম্পৃক্ততা, জনদাবীর প্রতি শতভাগ নিষ্ঠা এবং তা অর্জনে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের সদা প্রস্তুতির জন্যেই জনগনের অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর সংগঠন আওয়ামী লীগ। বলাবাহুল্য

বাঙালির আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক স্বার্থে এ সময় ব্যক্তি, সংগঠন নির্বিশেষে যিনি যত বড় উদ্যোগই নিয়ে থাকুন বঙ্গবন্ধুর অনুমোদন, প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সমর্থন ছাড়া তা গ্রহনযোগ্য ভিত্তি পায়নি। বঙ্গবন্ধুর বর্ষীয়ান রাজনৈতিক সহকর্মী এবং পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশে সুযোগ সন্ধানী রাজনৈতিক এতিমদের ভরসা সাদা পাঞ্জাবীর বর্ষা নিক্ষেপ কিংবা বিখ্যাত 'ওয়ালাইকুমুস সালাম' মূল সূর খুঁজে পেয়েছে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে। স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার পথে পথে জ্বালাময়ী শ্লোগান আবিষ্কার থেকে শুরু করে পতাকা তৈরী, উত্তোলন, সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণে নেতৃত্ব দিয়েছেন অনেক উজ্জ্বল তারুন্য। শতকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষনা। বলাবাহুল্য বঙ্গবন্ধুর আলো ছাড়া এঁরাও আলোকিত নন। প্রতিটি প্রতীক, প্রতিটি উদ্যোগ বঙ্গবন্ধুর হাতের পরশ নিয়ে, তাঁর অনুমোদন-সমর্থন নিয়ে ধন্য হয়েছে। কার্যকর এবং সফল হয়েছে। এই উদ্যোগগুলোর সুবাদে প্রতিপক্ষের জেল-জুলুম, অত্যাচার যেমন তেমনি বাঙালির অকুণ্ঠ ভালাবাসাও নির্ধারিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর জন্যে । তাই সঙ্গত কারনেই বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় এসব উদ্যোগের খন্ডিত কোন কৃতিত্ব নিয়ে টানা হেঁচড়ার দু:সাহস না দেখিয়ে সবাই বাঙালির আপন হয়েছিলেন, উজ্জ্বল হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু নামের সুর্যের আলোয়। ৭৫'র কালো অধ্যায়ের পর যখনই উপগ্রহগুলো অন্য রকম দাবী নিয়ে হাজির হন কিংবা তাদের হাজির করানো হয় তখন প্রকারান্তরে তারা নিজেরাই প্রথমত হাস্যষ্পদ হয়ে চুড়ান্ত পর্য্যায়ে পরিত্যক্ত হন। বঙ্গবন্ধুকে খাটো করার অপচেষ্টায় নিজে কিংবা অতি উৎসাহী শিষ্যদের তৎপরতায় এভাবে ইতিহাস থেকে খারিজ হয়ে যাওয়া নেতা-নেত্রীর সংখ্যা নেহায়েত কম নয় ।

৭১এর ২৬ শে মার্চ হানাদার কবলিত বাংলাদেশের নিরস্ত্র বাঙালি এবং বঙ্গবন্ধু উভয়ে যুগপৎ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের এক লক্ষ্য অর্জনে এবং পরস্পরের পরিপূরক দুই ফ্রন্টে। বাঙ্গালি বাংলাদেশের মাঠে ময়দানে, পথে-প্রান্তরে আর বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে। যুদ্ধের ধরণটাই এমন যে দুই ফ্রন্টের কোন একটিতে পরাজয় ঘটলেই চুড়ান্ত পরাজয় অবশ্যাম্ভাবী। দুই রণাঙ্গনে নেতা ও জনতার সমান আত্মত্যাগ ও সমান উপস্থিতি। জনতার আছে জয়বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু রণধ্বণি, নেতার আছে "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" কিংবা উভয়েই উভয়ের। তা স্বত্বেও বাঙালির বঙ্গবন্ধুর জন্যে ইতিহাস দাবী করেছে বাড়তি আত্মত্যাগ। তাই ১৬ই ডিসেম্বর দেশ হানাদার মুক্ত হলেও জাতিকে অপেক্ষা করতে হয় বঙ্গবন্ধুর কারামুক্তির। স্বজনহারা বাঙালির প্রথম বিজয় উৎসব বঙ্গবন্ধুর অপেক্ষায় থেকেছিল। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে বিজয় দিবস উদযাপিত হয়েছে প্রাণের উচ্ছলতায় কিন্তু অর্থবহ স্বাধীনতার জন্যে কৃচ্ছতা সাধনের মধ্য দিয়ে। মুক্তির সংগ্রামে নিবেদিত থাকার শপথ নেওয়ার মধ্য দিয়ে।

পরাজিত পাকিস্তান এবং তার বিদেশী মিত্র রাষ্ট্রসমূহ সহ এদেশীয় রাজাকার, আলবদর, আল শামস ইত্যাদি নামীয় দোসররেরা ভেবেছিল নয় মাসের পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞে যেভাবে তারা বাংলাদেশকে হীনবল, মেধাশুন্য করেছে, অর্থনীতিকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছে তাতে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ কোনভাবেই টিকে থাকতে পারবেনা। কিন্তু তাদের হিসেব ভুল প্রমাণ করে অতি দ্রুত বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ধ্বংসযজ্ঞ থেকে মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করে বাংলাদেশ। মুক্তিকামী বিশ্বে জাতিয়তাবাদী আন্দোলনে আশাবাদী নাম হয়ে উঠে বাঙালির বঙ্গবন্ধু। স্নায়ূযুদ্ধে লিপ্ত দুই পরাশক্তির মাঝখানে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনও উচ্চকিত হয় তৃতীয় বিশ্বের এই ভূমিপুত্রের উত্থানে। স্বাধীনতা সংগ্রামে পরাজিত শত্রু এবং তাদের ষড়যন্ত্রী মিত্ররা ভাবতে পারেনি বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে একটি মুসলিম প্রধান অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠী সাংবিধানিকভাবে সমাজতন্ত্রের ভাবধারায়, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র চরিত্র নিয়ে, ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারনা ছুঁড়ে ফেলে জাতিয়তাবাদী উদ্দীপনায় এতদঞ্চলে একটি স্বাবলম্বী ও আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভুত হবে এবং অন্যত্রও তা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

তাই কায়েমী স্বার্থবাদ এবং প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মাতাল ষড়যন্ত্রকারীরা বাঙালির বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বকে ব্যর্থ করে পাকিস্তানী ভাবধারায় ফিরিয়ে নিতে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এবং বাংলাদেশের মুক্ত বিবেক-বুদ্ধির মানুষকে চিরতরে স্তব্ধ করার প্রয়াস পায়। ৭৫এর ১৫ই আগস্ট ইতিহাসের বর্বরতম হত্যাকান্ড এবং তার ধারাবাহিকতায় অদ্যাবধি চলমান পৈশাচিকতা তার স্বাক্ষ্য দেয়। ষড়যন্ত্রকারীরা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে তা ভোগের চেয়ে বাঙালিকে দুশ্চরিত্র, দুর্নীতিগ্রস্থ বানিয়ে, নৃতাত্বিক জাতি স্বত্বার পরিচয় এবং রাষ্ট্রীয় চরিত্র পাল্টে প্রকাশ্যে মধ্যযুগীয় পাকিস্তান, আফগানিস্তানের কাতারে নিয়ে যেতে চায়। জাতির জনক এবং তাঁর পরিবারের সদস্যসহ নারী-শিশু হত্যার বিচার করা যাবেনা মর্মে সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা, খুনীদের দায়মুক্তি প্রদান এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে খুনীদের ভরণ-পোষন, লালন-পালন করা থেকে ষড়যন্ত্রকারীদের মর্ম জ্বালা এবং প্রতিশোধস্পৃহার তীব্রতা অনুধাবন করা যায়। ষড়যন্ত্রের দেশীয় হোতা মোশতাক-জিয়া চক্র প্রকাশ্য ঘোষনা দিয়েই বাংলাদেশে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্ব, সাংস্কৃতিক পশ্চাদমুখীনতার গোড়াপত্তন এবং তার বিস্তৃতির ধারা পাকাপোক্ত করে। বিসমিল্লা বলে ধর্মের নামে ধর্মকে কলুষিত করা। বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামে আওয়ামী লীগকে ঠেকাতে খুনী, দাগী আসামী ও রাজনৈতিক খুচরোদের দিয়ে রাষ্ট্রীয় প্রযোজনায় রাজনৈতিক দল উৎপাদন। যুদ্ধাপরাধী ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারীদের নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন। উন্নয়নের রাজনীতির নামে দেশকে বিশ্ব ব্যাংক এডিবির কাছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্থ দেয়া। যাত্রা-পালা-ভ্যারাইটি শো'র নামে শহুরে ক্যাবারে নতর্কীদের গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে এবং গ্রাম সরকার, যুব কমপ্লেক্স ইত্যাদির মাধ্যমে কাঁচা টাকা জুগিয়ে যুবশক্তির নৈতিক অধ:পতন ঘটানো। মুফতে নৌ বিহার, ট্রেন ভ্রমনের টোপে ফেলে ছাত্রদের চরিত্র হনন। কল-কারখানায় পন্যের বদলে ট্রেড ইউনিয়নের নামে ধান্ধাবাজ নেতা উৎপাদন ইত্যাদি এই নষ্ট সময়ের ট্রেডমার্ক। রাজনীতি পরাধীন যুগের ব্রত থেকে স্বাধীন দেশে পেশায় পরিণত হওয়া এবং রাজনীতিতে পলিটিক্স ঢুকিয়ে দেয়া এই অপয়া সময়ের স্মারক। স্বাধীনতার ঘোষক বিতর্কের তলে তলে স্বাধীনতা দিবসকে অন্য আট দশটা সাধারণ দিবসের মত জাতীয় দিবসে রূপান্তর, দলীয় সঙ্গীতকে জাতীয় সঙ্গীতের স্থলাভিষিক্ত করার অপচেষ্ঠা মোটকথা বাঙালির যা কিছু গৌরবের অর্জন তার সবকিছুকেই প্রথমে বিতর্কিত এবং ক্রমান্বয়ে পরিত্যাক্ত করার এটাই অন্ধকার যুগ। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ যেখানে অধিকতর রক্তপাত এড়াতে খুচরো রাজাকারদের পর্যন্ত ক্ষমা প্রদর্শন করে সেখানে স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমান তার ক্ষমতার মসনদ টিকিয়ে রাখতে নির্বিচারে খুন করতে থাকে মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তা এবং সাধারন সৈনিকদের। খুন-হত্যা-ষড়যন্ত্র হয়ে যায় রাজনীতির অংশ। বঙ্গবন্ধু যেখানে রাজনীতি ও আমলাতন্ত্রকে স্বাধীন দেশের উপযোগী করতে সংস্কারে হাত দেন সেখানে এই স্বৈর শাসক 'মানি ইজ নো প্রবলেম' ঘোষনা দিয়ে অদক্ষতা, চাটুকারীতা ও দুর্নীতির জাতিয়তাবাদী দোকান খুলে বসেন। ভোল পাল্টানো রাজনীতির এই বাণিজ্য মেলায় যে যত মিথ্যাচার করতে পারে, যার যত কলুষ তার তত জৌলুস প্রতীয়মান হতে থাকে। বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে নিজের পাপকে ঢাকতে তিনি দেশের সব সিনিয়র পাপীদের এক প্লাটফর্মে জড়ো করেন এবং ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিশীল পাপীদের পরিচর্য্যায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ইতিহাস তার উৎপত্তিতেই লিখে রেখেছিল যথাযোগ্য অনিবার্য্য পতন। কিন্তু ততদিনে ছাত্র-শিক্ষক, পেশাজীবি, কারখানার শ্রমিক মজুর সবার মধ্যে যে যার কর্মক্ষেত্রে কর্ম ছেড়ে জিন্দাবাদী নেতা হয়ে কেড়ে খাওয়া অথবা নিদেনপক্ষে উচ্ছিষ্ট ভোগের প্রবনতা বেশ ভালভাবেই ঝেঁকে বসে। ৯০'র গণ-আন্দোলনের মুখে দ্বিতীয় স্বৈরাচারের পতন ঘটলেও গনতন্ত্রের মোড়কে আবির্ভুত হয় পুরাতন মগের মুল্লুক। এই মুল্লুকে মুক্তিযুদ্ধ বাসী কথা। বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননা এই মুল্লুকে নিতান্ত ঠুনকো বিষয়।

বিপরীতক্রমে এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির অবসানকল্পে প্রলোভন, হত্যা, জোর-জুলুম-অত্যাচারের মুখেও বাঙালি একতাবদ্ধ হতে থাকে জাতির জনকের রক্তের উত্তরাধিকারী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পতাকাতলে। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে হত্যা-ষড়যন্ত্র, জোর-জুলুম যত বাড়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে তার প্রতিবাদ, প্রতিরোধও তত কঠোর হতে থাকে। বর্ষ পরিক্রমায় স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস আসে যায় আর পিতৃহত্যার কলঙ্ক নিয়ে আমার সোনার বাংলা শুধু নয়ন জলে ভাসতে থাকে। গণতন্ত্রের মোড়কে 'শহীদ সাহেব সিনড্রোমে' অতিষ্ঠ , কোনঠাসা বাঙালি ৭৫ পরবর্তী সময়ে প্রথমবারের মত দু:শাসনকে রুখে দেয় ৯৬-২০০১ সময়কালের জন্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন করে। দিন রাতের ফারাখ অনুভব করে বাংলাদেশ। অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক নানাবিধ শুভ উদ্যোগের পাশাপাশি দেশকে কলঙ্কমুক্ত করতে কুখ্যাত ইনডেমনিটি রহিত করন বিল পাশ হয় মহান জাতীয় সংসদে, বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের বিচারিক কায্যক্রমও শুরু হয়। প্রমাদ গুনে পরাজিত শক্তি। তারা মরণ কামড় দেয় ২০০১ সালের নির্বাচনে। পুনর্বার মৌলবাদী-যুদ্ধাপরাধীরা ক্ষমতার রাজনীতিতে মৌরসী পাট্টা গেঁড়ে বসে, খুনীদের আস্ফালন বাড়ে, রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রত্যক্ষ মদদে নানা নামের আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠন বাংলাদেশে ঘাঁটি গাড়ে এবং বাংলাদেশী জাতিয়তাবাদের সুযোগ নিয়ে খুব সহজেই এখানে বিয়ে-থা করে সন্ত্রাসের ঘর-গেরস্থালিতে মেতে উঠে। ভোটের বাক্সে বিহারী, রোহিঙ্গাদের কদর বাড়ে সুতরাং বাংলাদেশী জন্ম নিবন্ধন সনদ, পাসপোর্ট তাদের পাইয়ে দেয়া হয় যেমনটা পৌঁছে দেয়া হয় বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনীদের হাতে। রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি-দু:শাসনের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় কুখ্যাত হাওয়া ভবন এবং তার অধিশ্বর স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তনয়। মসজিদ-মন্দির-গীর্জা, পীরের দরগাহ-খানকাহ রক্তে ভাসে , দেশ জুড়ে সিরিজ বোমা হামলা হয়। গ্রেনেড হামলা হয় বিদেশী কুটনীতিকের উপর। পাশাপাশি সমানতালে চলতে থাকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জনপ্রিয় নেতাদের হত্যা যার চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় বর্বরোচিত ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে চিরতরে নিস্তব্ধ করে দেয়ার ঘৃণ্য তৎপরতায়।

বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ পরিচিত হতে থাকে দুর্নীতিতে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, সামাজিক অবক্ষয়ে চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হওয়া ব্যর্থ রাষ্ট্রের পর্যায়ে। আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমে শিরোণাম আসে "বাংলাদেশ থেকে সাবধান"। মেয়াদ শেষে নির্লজ্জ সরকার আবারও রাষ্ট্র ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার মরণপন দু:সাহস দেখায় । বশংবদ রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে সাজানো তত্বাবধায়ক সরকার এবং ততোধিক বশংবদ নির্বাচন কমিশন সর্বোপরি অনুগত প্রশাসন নিয়ে দু:শাসন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় বাংলাদেশকে। আর বাংলাদেশ লগি-বৈঠা নিয়ে রুখে দাড়ায় 'যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে' শত্রুর মোকাবিলা করার ঐতিহ্যে। রাজপথের বিজয় ছিনিয়ে নেয় সুশীল-সমাজের ছত্র ছায়ায় কচুক্ষেতের উনারা। ক্ষমতা কব্জা করার পুরাতন খেলায় ব্যর্থ হয়ে "লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড" গড়ার নামে আবারও চেষ্টা হয় দুর্নীতিবাজদের পাক-সাফ করে ভবিষ্যতের জন্যে তুলে রাখার। মূল লক্ষ্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বহীন করার। বার বার প্রতারিত বাঙালি সর্ব শক্তিতে রুখে দাঁড়িয়ে সমস্ত যন্তর-মন্তরকে ব্যর্থ করে দেয় ।

বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মঞ্চে গড়ে উঠা মহাজোট নির্বাচনে অর্জন করে জনতার নিরঙ্কুশ রায়- মহা বিজয়। ক্ষুধা-দারিদ্র্য-দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্নের নাম হয় ডিজিটাল তথা আধুনিক বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্নের মত এই রূপকল্পেরও প্রধান লক্ষ্য অর্থনৈতিক স্বয়ং সম্পুর্নতা অর্জনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়ন। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সময়ের দাবীতে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারিক কার্যক্রম সম্পন্ন করে জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করা। পাকিস্তানের দোসর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা। বাংলাদেশকে পুন:রায় মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে স্থিত করা।

পতিত স্বৈরাচার এবং তাদের দেশী-বিদেশী মিত্রদের নানামুখী ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে মহাজোট সরকার ইতোমধ্যে কৃষিতে প্রাণ ফিরিয়ে এনেছে। ক্রমবর্ধমান রেকর্ড পরিমান বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গড়তে পেরেছে। দেশের অর্থনীতিতে বিশ্বব্যাপী চলমান মহামন্দার প্রভাব ঠেকিয়ে রেখেছে। সবচেয়ে বড় কথা সাধারণ বিচারিক প্রক্রিয়ায় বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারিক কার্যক্রম শেষ করে জনমনে সুশাসনের স্বপ্ন আঁকতে পেরেছে। মুক্তিযুদ্ধের হারানো গৌরব পুন:রুদ্ধারের আশা এখন আর অলীক স্বপ্ন নয়। অভিষ্ট লক্ষ্য মুক্তির সংগ্রামে অবিচল জাতি এই বিজয় দিবসে অতি অবশ্যই প্রাণ খুলে গাইতে পারে- "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।" ১৯৭১এ এই অধিকার অর্জনের মত আজ তা পুনরুদ্ধারের মূল্যও অতি মূল্যে শোধ করেছে বাঙালি। ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে এখন শুধুই এগিয়ে যাওয়ার পালা।